প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৫৮

ট্রুভবার্টা দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

প্রকাশক

সুরজিৎ ঘোষ

প্রমা প্রকাশনী। ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ

কলকাতা-১৭

মুদ্রক

হরিপদ পাত্র

সত্যনারায়ণ প্রেস

১ রমাপ্রসাদ রায় লেন

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট। ৯ বিধান সরণী, কলকাতা-৬

উৎসর্গ

গোপাল লাহিড়ী

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

সূচী

অনন্ত এই শাওনবেলায়
সমস্ত খেল খতম, শুধু
কথাই আতসকাঁচকে খেলায়,
আর যতো খেলুড়ে খধূপ

থমকে আছে। কথক, তোমায়
পরীক্ষা আজ। তুমি এবার
আতসী এই কাঁচের জোরে

রশ্মি সংঘবদ্ধ করে
বধির ক'রো স্বর্ণলতাও :

বাচাল শব্দ পুড়িয়ে দাও

সীমান্তে

সবশেষে এল উদ্বাস্তুর ওয়াগন, কেউ বলে
ওরা সকলেই দক্ষিণ এশিয়ার,
অন্যেরা বলে গোয়েন্দা, তবু তাদের নয়নতলে
খেলা করে যায় রৌদ্র ও গ্লেশিয়ার।

কারো হাতে শুধু ভাঙা মাস্তুল,
কারো বেহালার ছড়,
দুয়েকজনের ছেঁড়া উষ্ণীষে
গোঁজা বইপত্তর।

এমন সময় উঠে দাঁড়াল সে, আকাঙ্ক্ষা করলেই
ভেঙে দিতে পারে ধ্যানধারণার সমস্ত অবরোধ ;
তাকে ছুঁতে গিয়ে গ্লেশিয়ার আর রোদ
দ'লে যাই, তবু দেখি সে কোথাও নেই।

নাকি মুক্তির ধারণাকে তার শহিদশীর্ণ দেহে
শেষ প্রান্তিকে নিয়ে গিয়েছিল বয়ে,
নির্বাসিতের তালিকায় তার নাম দেখতে না পেয়ে
মরেছে সকল শরণার্থীর হয়ে!

প্রয়াগে

যেমন মৃত্যুর বাড়িতেও
শিশুদের আনন্দের বন্যা বয়ে যায়
উঠোনে মন্দিরা খেলনা ছেয়ে থাকে

নিরপেক্ষ সে অপরিমেয়
আনন্দধারায়
আমরা ঈষৎ স্নান সেরে নিয়ে সেদিন প্রয়াগে

এ ওর দিকে তাকাচ্ছিলাম যখন দেখি দৃশ্যের একভাগে
সংসারীরা খরিদ করছে লাউডগা আর তাদের উল্টো টানে
সন্ন্যাসীদের খড়ম বাজছে যেন তাদের একটুও নেই দেহ —

আমরা তখন দু'দলের মাঝখানে !

অতিথি

এজেন্টরা তাকে বলেছিল 'আর-কিছু নয়, ভিটেমাটি আর বুড়ো মা-বাবাকে বিক্রি ক'রে দিলে তোমাকে চার্টার-প্লেনে নিয়ে যাবো ব্রাসেল্‌সে, সেখানে সৌধ পেয়ে যাবে তুমি', আরো যোগ ক'রে দিয়েছিল 'অন্তত ধার ক'রে নাও পনেরটা কার্পেট তাহ'লে জেট-কার্পেটে তোমাকে শুইয়ে নিয়ে যাবো তুমি কখন পৌঁছিয়ে গেছ টের পাবে না' ব'লে তাকে নিয়ে আসতেই সীমাশুল্ক-সেনানীরা ওকে ক্যোঅর্‌ন্‌টিনে তিনদিন রেখেছিল—আহা কী-সুন্দর ক্যোঅর্‌ন্‌টিন, যেখানে বিশ্বের যতো বাস্তুহারা অন্তত তিন ঘন্টা ক'রে একনাগাড়ে ঘুমোতে পারে বাকিটা সময় কিছু হাড়ভাঙা পরিশ্রম, যেম ন অতিথি-শ্রমিকেরা আনন্দে রাজ্যের আবর্জনা ব'য়ে নিয়ে যায় কিংবা পরিত্যক্ত ডাবগুলো ভিখিরির ছেলেরা নিয়ে গেলে পৌরসভা কিছুই বলে না—ঠিক চারদিনের মাথায় রাত-তিনটের প্লেনে তাকে রাওয়ালপিণ্ডি-র পথে রওনা ক'রে দেওয়া হলো ; এ পর্যন্ত সবটাই বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়েছিল, কিন্তু যেই দেখি তার বয়ে-আনা কার্পেটগুলোর প্রদর্শনীতে মেতেছে প্রলুব্ধ যতো তাত্ত্বিকেরা ব'লে উঠছে 'অনুন্নত অঞ্চলেও এত শিল্পের চেতনা / তুলনামূলক সমাজতত্ত্বের পক্ষে ব্যাপারটা আকর্ষণীয় খুব' আমি ব্যর্থময় হেসে উঠি এ হাসিতে অন্তত অংশত প্রতিবাদ লুকোনো আছে এই ভেবে ভালো থাকি পিচ্ছিল পুলকে

ন্যায়দণ্ড

দু'চারজন বসে আছে চৌরাস্তার কাছে রেস্তোরাঁয় ;
তাদের বন্ধুরা দেখছে গণেশ পাইন, দেখতে গিয়ে
ভুল তর্কে মেতে উঠে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে যাবে
এই মর্মে ভিড়-বাসে আচমকা কখন উঠে যায়—
এমন সময় দ্যাখে একটি মানুষ ভিক্ষা চায়
ধূপকাঠির পরিবর্তে, এইভাবে ইজ্জৎ বাঁচায় :
টিকিট-চেকার এসে একটি ধূপকাঠি দিয়ে মাপে
দশ পয়সা—ধূপের ওজন কম—'এ কেমন ইয়ে'
বলে সে বিনীতভাবে পসারীকে রাস্তায় নামিয়ে
ভয়ানক তৃপ্তি পায়। দু'চারজন যে-চায়ের কাপে
ঝড় তোলে আর এই প্রত্যক্ষদর্শীরা যারা ভাবে
শিল্পের বিষয়ে—ওরা কোনখানে মিলবে কী নিয়ে
শুরু করে দেবে বলো বন্ধুতার নতুন অধ্যায় ?
যদি এ প্রসঙ্গ নেয় সেটা বুঝি দারুণ অন্যায় ?

লেখার টেবিল

না, আজকেও কোনো চিঠি নেই,
না, লিখতে গিয়ে লগ্ন ছিঁড়ে গিয়ে
ঈথারের রক্ত ঝরে-যেতে-থাকা ছাড়া
আজ আর কিছুই ঘটবে বলে মনে হচ্ছে না।

তবু টেবিল জুড়ে মেদুর হয়ে আছে
যক্ষিণীদের পরিবেশিত
দ্বিতীয় প্রাতরাশের আলো

স্যানাটোরিয়াম ঘিরে জেগে উঠছে
সারি-সারি তালপাতার বিজয়সেনা ॥

এ প্রত্যূষা আনা পাভ্‌লোভার

আনা পাভ্‌লোভার হাতে হাঁসগুলো প্রাত্যহ-আহার নিতে গিয়ে
বুঝতে পেরেছিল নাকি তিনি যে নর্তকী! তাঁর দু'হাতে শুশ্রূষা
ঘুঙুরের বর্ণে বেজে আচম্বিতে থেমে গেল যেই
তখনো কি বুঝতে পেরেছে ওরা কোন্‌খানে তাঁর
মহিমা পুঞ্জিত ছিল? ওরা বুঝতে পারেনি বলেই
আনা পাভ্‌লোভার নামে বর্জহাঁসে সর্জিত এ উষা?

দহরাকাশ

দহরাকাশ রইল ভেসে আর্শি-ঘাসে
দহরাকাশ রইল বিঁধে ঘর-আকাশে

তাই তো অকূল ভালোবাসায় ঘর ভরিল
তা নইলে কি বেঁচে ওঠার অর্থ ছিল

আজ সকালে গিয়েছিলাম তার সকাশে
এখন ভাসে দহরাকাশ আর্শি-ঘাসে

অনুচিন্তা

কৈলাস পর্বত থেকে আচার্য শংকর
পাঁচটি স্ফটিক লিঙ্গ — তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন —
বহন করে এনেছিলেন।
আমি আমার নিতান্ত নশ্বর
শরীর নিয়ে এসেছি আজ কৈলাসের সমীপে, অতঃপর
দলিল রেখে যাবো না কোনো, হাওয়ায় শুধু ঝরাবো চিন্তন ॥

আর্তি মেখে

ব্রজ ত্বং স্রোতসি জলে তিষ্ঠ গেহে
এই বলেছি রাত্রিদিন, তুমি যে আছো
না বুঝে শুধু বলেছি 'থেকো' — আর্তি মেখে

মুহূর্ত মুহূর্ত গেছে তূর্ণ ব'হে,
লুপ্ত করে দিয়েছে যতো পৌর্ণমাসী,
আমাকে আজ শাস্তি দাও, ঈশ্বরী হে !

স্বশরীরে

শরীরে থাকাকালীন লজ্জিত ছিলেন প্লোটিনাস,
যেন-বা শরীর এক অবান্তর উপসর্গ ছাড়া
আর-কিছু নয় ; আমি তাঁর বই একপাশে রেখে
লক্ষ করি কেমন সহজে তুমি ছবি থেকে ধুলো
সরিয়ে পাশের ঘরে গিয়েছো আমার শরীরিণী !

নির্ধারণ

বতিচেল্লির 'চিরবসন্ত' ছবিটাকে ওরা ছিঁড়েখুঁড়ে শেষে
ফেলে দিয়েছিল, চূর্ণ-অংশগুলোকেও নিয়ে অনায়াসে যে-সে
খেলছিল।

আর এমন সময় আচম্‌কা এল ক্ষণবসন্ত
শিরীষে-শিমুলে, রমণীর চুলে, পুরুষের ভীরু-সাহসী আঙুলে,
আর তাকে নিয়ে কী করবে সেটা বুঝতে না পেরে হা-হতভম্ব
তক্ষুনি ওরা আরো একবার ডাক দিল বুড়ো বতিচেল্লিকে।

গ্রহণবর্জন

গত দশ বছর ধরে এদের কাছে আমি শুধু রক্তের
কার্পাস থেকে সুনির্বাচিত সূক্তের মতো কথা বলে গিয়েছি—
তার বেশির ভাগই এরা না বুঝে প্রশংসা করেছে,
ধরতে পারেনি অনুস্যূত অমোঘ দুজ্ঞেয়তা। আমারও
দোষ কম নয়, এরা জানে ভেবে অসংখ্য কথা
লুকিয়ে রেখেছি টেবিলের নিচে, তাদের অনন্ত
ছায়ায় প্রচ্ছন্ন রেখেছি—আমার বর্জিত সেই
সমস্ত কথা যদি এখন ফিরিয়ে আনতে পারতাম
এরা আমাকে বুঝতে পারত

আমিও কি সেই সব সরল ভাবনাগুলির সাগ্নিক
আলোয় নিজেকে আরো একটু চিনে নিতে পারতাম না ?

অনভিষেক

অন্তত অনভিষিক্ত থাকুক একজন
তার হাত থেকে
দীক্ষা নেবে পথের ভিখারী

শ্বেতকাঞ্চন রক্তকাঞ্চন
তাকে প্রতারণা করবে, ভিন্দিপাল ছুঁড়ে দেবে তাকে
নারী

তবুও অনভিষেক তার দিকে যেন চেয়ে থাকে !

মুক্তিস্নান

পথের মধ্যে হঠাৎ দেখি একটি-দুটি
ধীমন্ত ঘাস,
স্নানের পরে সন্ন্যাসী এক নগ্ন হয়েও
অক্রীতদাস
নিজেকে দেয় নতুন দীক্ষা, দিগন্তে আজ
নেই সন্ত্রাস :
এডিথ সিট্‌ওয়েলের পোষা বন্য পাখি
ডিলান টমাস ॥

অর্চনারত হাত

সমস্ত বদলে যায়, মাদাম তুসো-র মুাজিয়ামে
রাতারাতি নিক্সনের পরিবর্তে আরেক পুতুল
উঠে আসে! তাই বলি সময় থাকতেই কেঁপে উঠে
পরিবর্তনের সঙ্গে বৈপ্লবিক চুক্তি সেরে নাও ;
এখন মোমের শিখা দারুণ তুষারে জমে গিয়ে
অলীক স্থায়িত্ব নিয়ে চেয়ে আছে, তুমি যেন তাকে
মর্যাদা না দিয়ে সরে যেতে থাকো, সরে যেতে-যেতে
প্রাসঙ্গিকতার টানে আমাকে যখন ছেড়ে যাবে
অবজ্ঞা কোরো না শুধু আমার অর্চনারত হাত
যার নিচে তুমি আমি আমরা সবাই দ্রবমাণ !

ধাত্রী

নিথর মরুভূমির ভিতর
শুধুমাত্র মানদণ্ডের নিচে
আমার ধাত্রী-মা
তালের পাখা বুলায় আমার
নশ্বরতায়, যেন আমার
অক্ষাংশই আমার দ্রাঘিমা

তার সেই তালপাখার ছায়ায়
আমার মাথায় কিংবা দেহের
কিছুই তো জুড়ায় না, তবু
ধাত্রী আমায় ছায়া দেবার
মুদ্রা নিয়ে জগদ্ধাত্রী

যেন-বা তার মুদ্রা-ই সব, অকূল হংসবিমান !

গৃহপ্রবেশ বা একটি কবিতার দু'রকম আরম্ভ

যা দেখছি সেটাই কবিতা হয়ে উঠছে।

কাগজ এখন নিজেই স্পর্শ করছে কলমকে, আর দু'দিকের পাহাড়ি
ঝাউ জেগে উঠেছে গ্রে হাউণ্ডের নমনীয়তায় - এক-একবার নুয়ে
পড়ছে পায়ের কাছে—বললেই যে-কোনো আকার পরিগ্রহ করবে।
এতদিন বাদে অনক্ষর ভাবনাগুলি আমার হাতে খেলে যাচ্ছে
খরগোশের উচ্ছল সৌজন্যে।
খাড়াই ধরে চলে যাচ্ছিল একজন বিবাগী, তাকে তার অনর্পিত
মোরগঝুঁটি ঘুরিয়ে এক মুহূর্তে সংসারী বানিয়ে দিলাম। আমার
স্পর্ধাঋজু ছাত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম নরেন্দ্রপুরের অন্ধ ইউনিটে,
সেখান থেকে মানুষ চিনবার ব্রেইল বর্ণমালা নিয়ে এসে গুরুদক্ষিণা
দিয়েছে সে।
আর তাই ভয় হচ্ছে খুব, এইভাবে সমস্তই আমার বশ্যতা মেনে নিলে
সংস্কারক বনে যাবো আমি! এবার, এইবার এসব সম্ভাবনাকে রক্ষা
করতে হলে নিচু থেকে ছেঁটে দিতে হবে, তা নইলে বাচালতার হাত
থেকে
বাঁচানো যাবে না বাগিচা।

কিন্তু এ কবিতার শুরুতে আমি এই কথাটা বলতে চাইনি। আজ
আমাদের
গৃহপ্রবেশের কথা ছিল। এতদিন নৈনিতালের এই বাড়িটি ছিল
হল্যাণ্ডের
এক ভদ্রলোকের। নিজের হাতে বানিয়েছেন এই বাড়ি, তাঁর নিজের
হাতেই
তৈরি এই বাগান।
এতদিন পর, হঠাৎই, দেশে ফিরে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর বাড়িটির দখল
নিতে আসছিলাম। ডুলি থেকে মাকে নামিয়ে তাঁর বাড়িতে প্রবেশ
করতে যাবো, এমন সময় তিনি বলে উঠলেন: 'এখনো কিন্তু এই
বাগান আমার।' আমাদের ভাড়া-করা পুরোহিত বিধান দিলেন:

'দেরি হয়ে যাচ্ছে, আপনারা এক্ষুণি ঢুকে পড়ুন। এই দেখুন পাঁজিতে লেখা শুভকর্মের সময়। গায়ে হলুদ অন্নপ্রাশন বিপণি আরম্ভ নৌকাগঠন শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধানকাটা। এই দণ্ডেই বাড়িতে না ঢুকলে নক্ষত্রে আর অমৃতযোগ থাকবে না।' হল্যাণ্ডের মানুষটি বললেন :

'একটু দাঁড়ান, আপনাদের মাকে আমার বাগানের টিউলিপ কেটে দিই।'

ব'লেই তাঁর বাগান থেকে বাগানটা তখনো আমাদের হয়নি - পাঁচটি রক্তাক্ত টিউলিপ তুলে মায়ের হাতে দিয়ে নিবেদন করলেন 'হ্যাঁ, এখন আপনারা ঢুকে পড়তে পারেন, আমার আর-কিছুই বলার নেই।'

বাড়ির চাবি সন্ধিক্ষণের মতো কাঁপছে তোমার হাতে, মাকে ধরে তুমি বাড়ির
ভিতরে নিয়ে যাচ্ছো, সেই সুযোগে আমি গৃহত্যাগী মানুষটিকে এগিয়ে দিতে
থাকলাম। তাঁকে সান্তবনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বারবার ঠোক্কর
খেয়ে পড়ছিলাম আমার নিজস্ব নুব্জ শব্দশূন্যতায়। এই নিঃশব্দতা কবিতার
কেউ নয়, সংস্কারকেরাও তাকে মূল্যবোধের মধ্যে গণ্যই করেন না। তবু
নিজের মধ্যে গুমরে-মরা শব্দের এই অনটন থেকেও আমার এ কবিতার
আরেক রকম সূচনা হতে পারে। মানুষটি আর এই বিরল সূত্রপাতের কবিতার মাঝখান দিয়ে আমি স্টেশনের দিকে হাঁটতে থাকলাম, পাহাড়ি ঝাউগুলি হঠে যেতে থাকল, সেই ছাত্রটি এক ঝটকায় তার উপহার দেওয়া
হরফগুলো ফিরিয়ে নিয়ে গেল, যাকে আমি তুড়ি মেরে সংসারী বানিয়ে দিয়েছিলাম অভাবের তাড়নায় তাকে খিন্ন দেখাল বড়ো। তবু কষ্টার্জিত এই কবিতার মুখ প্রতারণাহীন বলে তার সঙ্গে চুম্বনের বনিবনা হতে দেরি হলো না আমার।

গার্হস্থ্য সমুদ্র একাকার

উড়িষ্যার সীমান্ত পেরিয়ে
বালি আর বালি যেন গার্হস্থ্য সমুদ্র একাকার

যাইনি চন্দনেশ্বর দেবতার মন্দিরে আমরা
যদিও জাগ্রত তিনি

'ওটা কিন্তু দেখে যান' — সৈকতাবাসের একজন
এই ব'লে উপুড়-করা কাছিমের দিকে হেঁটে যান

আমরা দাঁড়িয়ে থাকি আমাদের দু-মুঠি সংসারে
সম্বল বলতে শুধু কলকাতা যাবার ভিসা

ন্যায়নিবন্ধ

নিজের মেয়েকে চুরি করে নিয়ে ছায়াপথ ঘিরে
চলে যাচ্ছিল হাতেনাতে তাকে ধরা হল যেই
নিজেকেই নাকি চুরি করে নিয়ে চৈত্রসমীরে
বলে উঠেছিল 'আমার বলতে কিছুই তো নেই
শুধু আছি আমি,' বলতেই তাকে ছিঁড়েখুঁড়েছিঁড়ে
ফেলে দেওয়া হল চেতলার কালো সেতুর গভীরে

ভাঙা এক চতুর্দশপদী

অতিরিক্ত একটি চন্দনা
এল আর চলে গেল, আমি তাকে কখনো চাইনি,
ভুলেও চাইবো না।
আমি জানলার এপারে
'জানালা' শব্দের দূর পর্তুগীজ উৎস খুঁজে খুব
নিমগ্ন ছিলাম। কোনো বিচিত্র কাহিনী
শুনতে চাইনি, আর এমন সময়
দেখা দিয়ে রেখে গেল সহানুভূতির দ্বীপান্তরে
অবান্তর একটি চন্দনা।

মথুরা প্যাসেঞ্জারে

'যা ঐ পাথরটাকে পাহাড়ের কাছে রেখে আয়'
বললেন বকুলপিসি 'জানিস নে গোবর্ধনগিরি থেকে
যতোই পাথর লোকে নিয়ে যাক সেসব পাথর
মাঝরাত্রে গড়িয়ে-গড়িয়ে ফের উৎসে ফিরে যায়…
না যদি রেখে আসিস ভয়ানক পাপ হবে তোর।'

না আমি পাথরটাকে ফিরিয়ে দেবো না, বহুকষ্টে
তোমাকে, বকুলপিসি, ঘুরিয়ে এনেছি বৃন্দাবন,
তোমার ছেলেরা করে বোম্বে লখ্‌নো—আমিই তোমাকে
হাত ধরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছি পতিতপাবন,
আর ঐ পাথরটা সেই দুর্ভোগের সাক্ষী গোপাল,
হয়তো, তুমি যা বললে, পাথরের হাত-পা গজাবে
একদিন, আপাতত ঈশ্বরের সঙ্গে আড়ে-আড়ে
লড়াই দারুণ লাগে, আমার এ উপান্ত্য বয়সে
নিজের কয়েকটা গোঁ আঁকড়ে রাখা, সেটা সোজা নয়,
এখন লিখতে গেলে সমগ্র স্নায়ুতরঙ্গ কাঁপে,
এখন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মনে হয়
তারও দিকে ত্রুটি ছিল, শারদোৎসবেও দুঃসময়
মনে হয়, বেইরুটে নইলে কেন ধর্মের সংসারে
এত বিদ্বেষের ঘটা ? শান্তি আন্দোলনের ছেলেরা
নিশ্চিত জয়ের মুখে এলিয়ে পড়েছে একেবারে ?

এসব বলতে চাই, বলা হয় না, তবুও আমার
বকুলপিসির সঙ্গে বচসা, মথুরা প্যাসেঞ্জারে !

ইন্দ্রপ্রস্থ

যমুনার ঐদিকে একদিন অজস্র মানুষের
বাড়ি হবে। কবে সেই একদিন ঘনাবে, সেই কথা
এখনো জানে না কেউ, তাহলেও তাঁর ঘেঁষে ঢের
শান্ত আছে ; 'এরকম ভারতীয় স্থির নিশ্চয়তা
আত্মহননের কোন্ নামান্তর ?' প্রশ্ন ক'রে ফের

অপ্রস্তুত যে-ছেলেটি সরে গেল, তাকে যে চিনি না
এজন্য আমার মনে ক্ষোভ নেই। আপাতত দেখি
যৌথ অপেক্ষার যজ্ঞ। অর্বাচীন আমাকে ভাবে কি
এরা, আমি শুধুমাত্র নিরপেক্ষ চেয়ে আছি কিনা
সেই দোষে ? আমি বুঝি একালের, ওরাই সাবেকি ?

আমি তবু প্রাণপণে চেয়ে থাকি। যজ্ঞের অনলে
একপ্রস্থ বৃষ্টি নামল অকস্মাৎ, ঘি-রঙের মেঘ
ঝল্‌কায় আহুতি, অমনি 'বাড়ি চাই' 'বাড়ি চাই' ব'লে
ছুটেছে সবাই। তবে স্থৈর্যেরই ভিতরে এ উদ্বেগ
সুপ্ত ছিল ? প্রশ্ন নিয়ে ঘুরে যেতে গিয়ে দেখি কোলে

নাতনী নিয়ে একান্তে বসে আছে অশীতি-বিসারী
বনোয়ারি। সে বলল : 'আমাদের নয়দা অঞ্চলে
এটা তো জানা-ই কথা যমুনা বন্যার ঝাঁপি খোলে
বারবার, তবু কিনা নিজের বসতি হলে ভারি
মজা হয়, ঘর থেকেই প্লাবনের পার্বণ তাহলে
দেখতে পাবো।'
                একদিন সবাই যখন পাবে বাড়ি
বন্যা এলে জলের শায়কে শুধু ভীষ্ম হয়ে ভাসবে বনোয়ারি।

অঙ্গীকার

এই কুমারীর ভুরু শুরু হয়ে সমাপ্ত হয়নি,
ঐ ভিখারীর পাত্রে রুটির বদলে শিশিরের
অমূর্তে আগ্রহ জমা হয়ে আছে। এ গাছে রজনী,
অন্য গাছে ঢের
সকাল হয়েছে। এই ঘরে ফিরে এসেছে ঘরণী,
অন্য ঘরে লেগে আছে দীর্ঘ গৃহহীনতার জের।

তবু এই দ্বিধার ভিতরে
চিহ্ন রেখে যেতে হবে তোমাকে, আমৃত্যু পণ ক'রে
রেখে যেতে হবে কিছু।
সেটা যেন কখনো না পারো
এই ভেবে দু'পক্ষই তোমার বিপক্ষে কাদা ছোঁড়ে!

মেয়েটি

হাওয়ায় দোলে ও কার কানপাশা ?
ভাঙ্‌ল ফের আমার সন্ন্যাসা,
গান বাঁধবো, ভালোবাসার গান —
আত্মদান, আত্মপ্রতিদান ।

হাওয়ায় শুনি : 'ভালোবাসাই গান'
মাটিতে আমি তাই বেঁধেছি বাসা—
আকাশ থেকে তবুও যাওয়া-আসা
করছে এক বরেণ্য-প্রধান :

নেবেই নেবে আমার গর্দান ।

ট্রিগার-সুখী

এই মানুষটি একটু-শুধু আত্মমুখী,
তাছাড়া আর কোনো দোষ নেই,
এই মানুষটি শুধু-একটু ট্রিগার-সুখী,
আর কোনোজন কাছে বসলেই
পিস্তলে তার সলতে জোগায় সুড়সুড়ি কি ?

প্রশ্ন করে জবাব পাইনি, সবাই বলে
বড়ো ভালো মানুষ ও যে
শৃঙ্খলা চায়, তাই তো মাতে দল বদলে,
রাত্তিরে শিশুদের টিফিন-কৌটো খুলে
বারুদ খোঁজে !

মাদ্রিদ

মানুষ যেন শুধুমাত্র পায়ের উপর ভর ক'রে দাঁড়িয়ে।
রেফারি মাঝে-মাঝে
হলুদ কার্ড দেখায় বটে, মানুষ তবু দোষ করেনি কিছু ;
অধিকাংশ আরব্ধ গোল ফিরে আসে লক্ষ্যমাত্রা থেকে—
দর্শকদের গ্যালারিতে জয়পরাজয়আলুঠানো লটারি,
মালা জপছে এমন-কি এক নুব্জ পুরোহিত
—লাতিন আমেরিকার—যেন এইবারে তার সংঘ জিতে যায় ;
লাইন্‌স্‌ম্যানের সবুজ ছায়ায় বুঁদ হয়ে রয় ম্যাসকট-শিশুরা
তাদের চুরি করবে যারা মানুষজনের অন্ধকারে মিশে
লুকিয়ে আছে সেসব সরীসৃপ ;
শাপশাপান্ত মেনে নিয়ে শান্ত্রীরা চোরছ্যাঁচড়ের মাসতুতো
ভাই হয়ে যেই ঈষৎ শূন্য পরিসরের পিঠে বসায় গুঁতো
বেকেনবাওয়ার ভদ্র খেলোয়াড়—
নিজস্ব বিগ্রহ ভুলে থুতু ছিটোয় দর্শকদের দিকে

মানুষ তবু স্বনির্ভর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকুক !

ঈশ্বরের গোয়েন্দা তুমি

ঈশ্বরের গোয়েন্দা নারী তুমি
আমায় পূজা করতে গিয়ে তোমায়
পূজা করতে দিয়েছো। ঝলমলায়
পবিত্র ক্রোধ তোমার, 'দরদিনী'
ভাবতে গিয়ে দেখি আমার ভুল

ঘরের খেয়ে বনের মোষগুলো
তাড়াচ্ছিলাম এমন সময় ত্রিশূল
ব্যাপ্ত ক'রে দাবি করলে সমিধ

মহিষাসুরমর্দিনি !

ভাসান

চূর্ণ ক'রে দিতে গেলেও
ভিতর-ভিতর ভালোবাসা
মিশেই থাকে। মুষ্টিমেয়

বিপ্লবীরা ট্রামের লাইন উপড়ে আসার
মুখে যেমন সর্বনাশা
সুপ্তিরাতের প্রেমের ভাষা

আওড়েছিল। তাই বলেছি : 'তোমার দেহ
নিয়ে তুমি আজ সকালেই অস্তে যেয়ো'
বলতে-বলতে শূন্যে তাকে দিলাম ভাসান···

অমনোনীত

দেখেছো, দিগন্ত আজ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে ?
এক-একরকম মেঘ জেগে আছে এখানে-ওখানে ;
আমার কবিতা ওরা প্রকাশ করেনি এ সংখ্যায়,
শুধুই তোমার ছবি সবগুলো স্টলে শোভা পায়,
আমি আজ আমার এই অমনোনীত হবার মানে
বুঝতে পেরেছি । এত আনন্দেও লজ্জাহীন যেচে
একবিন্দু ঈর্ষা কেন থেকে-থেকে ধমনী কাঁপায় !

বিচারক

তুমি কি আমায় কয়েদখানা থেকেও সরিয়ে দিতে চাও ?
কোথায় নিয়ে ফেলবে তুমি আমাকে ?
আমি যেখানেই পেঁছিই আমার চতুর্দিকে তৈরি হতে থাকে প্রতিশ্রুতির স্বর্গ—
আমায় কীভাবে শাস্তি দেবে তুমি !

এইভাবে ছড়িয়ে রাখো

এইভাবে ছড়িয়ে রাখো
বাবার ঠিকানার খাতা আর
এমন-কি ভগবদ্‌গীতা

সত্তার ঐশ্বর্য যতো আরো
এইভাবে ছড়িয়ে রাখো।
যেন কারো
—যে শুধু সমস্ত-কিছু কুক্ষিগত ক'রে নিতে চায়
নজরে না পড়ে কোনোক্রমে

গচ্ছিত না ক'রে রাখো সব সত্য অনাথ-আশ্রমে!

প্রত্যাহার

ক্যাটালগ অনুযায়ী সাজানো তোমার বাড়ি—
এখানে টেবিলবাতি, ঐখানে কার্পেট,
বেতের চেয়ারগুলি করে যায় একই আলোচনা।

তোমার বাড়িতে আমি যাবো না যাবো না
গেলেই তালিকাভুক্ত হয়ে যাবো,
যেখানে দাঁড় করাবে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে
আজীবন, যেরকম চন্দনকাঠের আলমারি ॥

চন্দ্রবোড়া আনে সূর্যমুখী

আজকে তুমি হও দারুণ সুখী
যন্ত্রণার গূঢ় সাম্যভারে
সকল নদী যবে এক জোয়ারে
হয়েছে আলোড়িত ; প্রহরী যতো
অটুট আর নয় রাজদ্বারে,
প্রাসাদগুলি চুপে জলের ধারে
দাঁড়িয়ে অর্ধেক-বিসর্জিত

আজকে তুমি হও দারুণ সুখী -
চন্দ্রবোড়া আনে সূর্যমুখী !

সেতুর কিনারে

প্রজ্ঞাপ্রবীণ একটি মানুষ
ভীষণ গোপনে এসে দাঁড়িয়েছে
সেতুর কিনারে, মেঘলোক থেকে
তাকে সত্বর মনীষী হবার
প্রলোভ জোগায় শরতের মেঘ ;
রাজনৈতিক নেতৃত্বের
মন্ত্রণা দেয় ক্ষুরধার নদী ;
প্রজ্ঞাপ্রবীণ মানুষটি শুধু
চেয়ে দ্যাখে এক দারুণ দরদী
জলে ভেসে তবু আকাশ প্রমাণ
ভাওয়াইয়া গানে ভুবন কাঁপায়—
প্রজ্ঞামানুষ তাকে ছুঁতে গিয়ে
জন্মের মতো খুব বাধা পায়।

পূর্ণদাস বাউলকে বললাম তাহলে সবসুদ্ধ এই এগারোটা গানই থাক তিনি বললেন না না তা কী করে হয় আরো একটা জুড়ে দিলে তো একযুগ পূর্ণ হয়ে যায়…আপনি আরো-একটা বাউল এখানকার ভাষায় তর্জমা করে দিন-না তাহলেই গোটা ব্যাপারখানা মানুষজনের সমঝে নিতে সুবিধে হবে

ভেবে দেখলাম পদ্ম দিয়ে একটা সাঁকো তৈরি হয়েছে তার উপর দিয়ে ত্বরান্বিত দ্বিধার উপর ভর করে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে আসছেন রাধারানী তাঁর সময় নেই যেতে-যেতে দম নিতে এক-একবার যখন দাঁড়াচ্ছেন পা ঘষে আলতা পরিয়ে দিচ্ছেন ললিতা বিশাখা চন্দ্রাবলি— তাঁর পথপ্রদর্শক একজন বাউল আর এই সাঁকোটা প্রতিদিন পদ্ম দিয়ে পুনর্নব করে তোলার দায়িত্ব তার উপরেই ন্যস্ত নইলে সেতু কবেই যেত শুকিয়ে

আমি পূর্ণদাসকে বললাম 'হৃদয়কমল চলতেছে ফুটে কতো যুগ ধরি' গানটা আমি অনুবাদ করে দিতে পারি তিনি বললেন না না ঐ গানটা খাঁটি নয়, আরেকটা গান দিন

ঠিক আছে, আগে তো বারোটা গান দিয়ে একযুগ পূর্ণ হোক তারপর নতুন করে অন্য যুগের কথা ভাবা যাবে— আপাতত এই যুগের বাকি খুঁটিনাটির মধ্যেই মোকাবিলা হয়ে যাক রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের ভালোবাসা কতোখানি নিখাদ

হাইডেলবার্গের দুর্গের নিচে, নেকার নদীর কিনারে, নব্য-বৈষ্ণবদের ভিড়ের ভিতরে গাইতে-গাইতে এগারো নম্বরের আইটেম টপকে গিয়ে পূর্ণদাস দ্বাদশের গান শুরু করতেই দেখি সেতুটার উপর দিয়ে রাধা আসছেন সম্পূর্ণ একা, তিনি কি জানেন এপারেতেও কৃষ্ণ নেই আমার বিশ্বাস তবু সপ্রতিভ অবিশ্বাস আর মূর্খ বিশ্বাসের অতিশায়ী আজ তাঁর প্রেমের মুক্তক ছন্দ যেমন বেণী তেমনি রয়েছে চুল ভেজেনি অসতী নন তিনি সতীও নন সংক্ষিপ্ত কণ্ঠিবদলে নয় রুদ্রাক্ষের আবর্তের মধ্য দিয়ে ভালোবাসার মন্ত্র বলতে-বলতে কল্পান্তকে সংজ্ঞা দেবার জন্য চলে আসছেন তিনি

অনুবাদ থামিয়ে আমি জঙ্গম ঐ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকি

উদ্বৃত্ত

কিছু কথা শুনেছিলে মুদিত নয়ানে
বাকি কথাগুলি
কিছু ধানখেতে কিছু পাশের বাগানে
ছড়িয়ে গিয়েছে, তবু যেটুকু শুনেছো
হয়েছে ধ্রুপদী পদাবলি।

চেয়ে ছাখো

ততোক্ষণ মাথা ঝুঁকে পড়ে থাকো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে—
যদি বই পাওয়া যায়, আর যদি না-ও পাওয়া যায়
চেয়ে দ্যাখো কার্ল মার্ক্স পড়তেন কোন্ প্রান্তে বসে,
ইউনেস্কোর উচিত ঐ জায়গাটাকে তীর্থ বলে প্রতিপন্ন করা।

কোনো বই পাওয়া যায়নি ? এসে যায় না, এই চেয়ে দ্যাখো
শুধুই আজকের জন্য প্রদর্শিত হয়েছে এখানে
কীট্সের হাতের লেখা চিঠি :
'পীসা থেকে এক ভদ্রলোক, শেলি, চিঠি লিখেছেন
ওঁর কাছে যেতে !'

অন্তত এ চিঠিখানি সংরক্ষিত আছে সভ্যতায়,
এসো, এই কথা ভেবে আত্মহত্যা মুলতুবি রাখি।

ধুলোর মজা

তিরিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে
রয়েছ যারা চিঠি লিখলে যদি উত্তর দাও
দ্বিগুণ সময় পরে পাবো। এখন তাই প্রেমের কবিতাও
লিখি না আর তোমাদের উদ্দেশে ;

ঘরের মধ্যে পূব-পশ্চিম, দু'রকম পূব দু'রকম পশ্চিম,
ক্যাম্প ডেভিড পেরিয়ে শেষে উত্তরের দক্ষিণের দেশে
তর্ক জমে, গ্লোবের নীলে সূর্য আরক্তিম,
ভোর নাকি গোধূলি, সেটা না বুঝে আর সৌর পরিবেশে

কী করে যাই ? ধুলোয় মজে আজ আমি এক বাঙাল ঘর-কাতুরে।

শেখভের সমাধির মতো

এই চিন্তা
শেখভের সমাধির মতো
ছোটো

তুলসীতলার চেয়ে
ক্ষুদ্রতর
জননী মেরীর গর্ভগৃহের চেয়েও

ক্ষুদ্র
গৃহগর্ভের চেয়েও
'চৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতা যেইখানে রেখেছেন দেহ

আর তাঁর মরবার পরিসর এতই ছোটো যে
যেন তিনি কখনো-কিছুই
লেখেননি

লিখলেও
এতই ছোটো যে
তার মতো বৃহৎ কিছুই নেই

এর মরা ওর বাঁচা

‘মানাগুয়া কোনখানে,
নিকারাগুয়ায় নাকি ?
ভূমিকম্পের টানে
কতো যে মানুষ পাখি
মরেছিল কেউ জানে ?’

জানতে চেয়ে সেজন
ভিড় থেকে ভিড়ে গিয়ে
স্রোতের মুখে উজিয়ে
ঝরাল তার জীবন ।

একটি মাতব্বর
প্রশ্নের উত্তর
জেনেও অতি তুখোড়

নিরুত্তরের কাঁচে
মুখ রেখে দিল দৌড়—

এভাবে অনেকে বাঁচে !

ভারতবর্ষকে নিয়ে

শিবালিক গিরিমালা

তিতির শিকার ক'রে অস্তাহ্নে নিষাদরুদ্র যায়

তিন যুগ পরে দেখা, প্রথমে তো চিনতেই পারিনি,
তাছাড়া আরেক ঢোল, ডান হাতে ইস্পাতের বালা,
যাকে সে করেছে খুন তার কাছে রয়েছে আ-ঋণী—
মৃত তিতিরের মুখে মেলে ধরে নৈবেদ্য নিরালা ;
তাকে তিরস্কার করে সূর্যাস্তের রাগতরঙ্গিনী

সহসা নিষাদরুদ্র নুয়ে পড়ে নমঃশূদ্রতায়

লছমনঝুলায়

খুব ভালো হয়েছে এই যে আকাশের গাঁথনিও এখন তলিয়ে যাচ্ছে আর চৌদিকের চোরা অন্তরীক্ষ থেকে ঢুকে পড়ছে বেনো জল ; একটু আগেই যে-প্রেমিক লছমনঝুলা পার হচ্ছিল তাকে সর্বস্বান্ত করে অলকানন্দায় ফেলে দিতে গিয়ে পাণ্ডারা চমকে এ ওর দিকে তাকালো—পড়ন্ত আকাশ তার শিথিল ভিত্তি নিয়ে তাদের মাথার উপর নেমে আসছে। আর সেই হৃতরিক্ত প্রেমিক তার উদ্বৃত্ত ধরিত্রীটুকু নিয়ে যখন উঠে দাঁড়াবে সেইখানে ভর রেখে আকাশ তার টলে-যাওয়া ভিত্তি নিয়েও বিশ্রাম নিতে পারবে এখনো আরো কিছুদিন অন্তত

হরিদ্বারের পথে

●

তোমাকে বলেছি তুমিও গুনেছো
য়্যুক্যালিপটাস পথের শিথানে,
'ওরা অর্বুদ' ব'লে বাতিদানে
নতুন প্রতীতি জেবলে দিয়ে প্রিয়
ভরে দিলে গান অগীতবিতানে

'ড্রাইভার ফেরো, গুনে নিতে হবে
এ পরিসংখ্যা কতোটা অজেয়'
এই ব'লে আমি বহ্‌ৎসবে
নেমে যাই, এই সংশয় সে-ও
দ্বিতীয় প্রতীতি জেবলে ধরে নভে

জুবিন মেহ্‌তা

আমরাও টিকিট পাইনি। তবে অবক্ষয়
মেনে নেবো? সে-আঙ্গিকও মূঢ় মনে হয়।
বরঞ্চ দেখতে পাই এই প্রত্যাখ্যানে
দারুণ আনন্দ এক, আজ কে না জানে
কারো-না-কারোর কাছে ঠিক তোলা আছে
হ্বাগনারের 'পার্সিভাল'; ইমনকল্যাণে
ভর দিয়ে অমনি যাই উত্তাল স্বরাজে
প্রকাশ আপ্তে-র বাড়ি, চোদ্দ পায়ে হেঁটে
সাতজন, শুনলাম সংবৃত ক্যাসেটে
ঐকতান।
আর তুমি? বলো কি পেলে তা
প্রেক্ষাঘরে, অন্তরীণ, জুবিন মেহ্‌তা?

গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে।
অনেকদিন সকালবেলায়
পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে
সেই সরোবরের মাঝখানে
শিখমন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই
ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা
সেই শিখ উপাসকদের মাঝখানে
বসিয়া সহসা একসময়
সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন—

বিদেশীর মুখে তাহাদের এই
বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা
উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া
তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময়
মিছরির খণ্ড আর হালুয়া লইয়া আসিতেন।

স্বর্ণমন্দিরের চূড়া জীবনস্মৃতি-র গায়ে লেগে

স্বপ্নের ভিতরে আমি জেগে
একপাত্রে জল রেখে এক টুকরো চিনি
ছুঁড়ে ফেলে ছুরি দিয়ে জল নিয়ে করি ছিনিমিনি—
তুমি কি আমার ধর্ম নেবে, নারী, তোমারও শরীরে
দেবো এই জল। ভাই, তুমি কি আমার ধর্ম নেবে,
তাহলে আমার সঙ্গে এসো এই কনকমন্দিরে,
আমরা একসঙ্গে রাখবো ওষ্ঠাধর গ্রন্থসাহেবে,
সমস্ত বিভক্ত জল একাকার করে দেবো বেঁটে ;
দেখিনি এমন খড়্গ জলকেও দিতে পারে কেটে,
কবিবন্ধুদের মধ্যে অমৃতসমুদ্র সঙ্গোপনে
দুলে উঠে কম্বুগ্রীব হয়ে যায়, যে-নীল তোরণে
গগনমৈ থাল, রবিচন্দ্র দীপক বনে

নারী

জলস্রোতে এতক্ষণ ওরা
বিচ্ছিন্নতার দিব্য সর্বনাশে
ঘুরেছিল ঊর্মির উল্ভাসে
যেন জ্যাক লণ্ডনের কোনো গল্পে

হঠাৎ জলের খুব মধ্য থেকে
উঠে এল নারী এক
এইবারে শুরু হবে সংহতির দুরূহ ঝামেলা—
তারপরে বিচ্ছিন্ন ওরা হয়ে যাবে শেষবারের মতো

নিয়তি

কী নিয়ে কবিতা লিখবো জানি না বলতেই দেখি ফিরে পাওয়া গেল বহুদূরে
স্থতজগতের অংশগুলি, আমি জুড়তে গেলেও ভেঙে পড়ে,
এ ওর গাঢ়তা থেকে বিচ্ছেদ্যতায়, আমি ঘৃণা করি ব'লে উঠতেই
পরস্পর গলাগলি রৌদ্রের বাগানে যেন প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সোনালি কুকুর
সখ্যের সংগ্রামে মেতে ছুটে যায় এক-একরকম বল আলতো কামড়ে ;
এ উপমা পেয়ে আমি শিশুর মতন খুশি, হঠাৎ কোথাও তুমি নেই :
তার অর্থ, আমাদের নির্মিত বাক্‌রীতি আর অনুভাবনার সমান্তরে
চলেছে দয়িতা আর বস্তুবিশ্ব, সকাল/দুপুর ; আমি যেই
এই মর্মে একা-একা সান্ত্বনা পেয়েছি যেই সহাস্যে আবার অন্তঃপুর
দখল করেছো তুমি—দেখে ভাবি আমিও নিয়তিবাদী ; তাই অন্যদের
নিয়তিকে দিতে চাই প্রত্যাশাখচিত শৈবত সুর !

প্রত্যর্পণ

অগ্নিমন্ত্রে তোমার শরীর বিক্রয় করেছিলে
যাঁর কাছে তিনি এখন তোমার আগুনে ভাঙিয়ে খান ;
মহিলা-সমিতি থেকে ফিরে এসে ধরালে যখন স্টোভ
বৈশ্বানর কি সহসা মূর্তিমান্ ?

তাহলে এখন একবার তুমি জেবলে ধরো বিক্ষোভ
তাঁর ঐ দয়ার ভিক্ষা হাজার গ্রীটিংস্-কার্ডগুলোয়
আগুন ধরিয়ে দাও ।

নিবিড় নিরক্ষর

এখন তোমায় বিরক্ত করব না ;
বই পড়ছো অন্ধকারে বসে
সাঁওতাল পরগণায়

কালকে ছুটি ফুরিয়ে যাবে, তোমার
পড়তে থাকা বই নিয়ে খুব করব আলোচনা
পথের সেমিনারে

আজ তবুও আনন্দিত নিরক্ষর আমি
চেয়ে রয়েছি তোমার বই পড়ার দিকে অপার
স্নিগ্ধ আক্রোশে

জীবনে গিয়ে

এস্কিমোর শিশুরা যেমন শিকার থেকে
শূন্য হাতে ফিরে আসে না, মাছ অথবা
এক দঙ্গল তুষার কিংবা কিছু-একটা
নিয়ে আসে, যাও, অদম্য দুঃসাহসে
তুমিও আজ জীবনে গিয়ে নিজের হাতে
নিংড়ে আনো একটা শামুক সে যখন তার
ঘর ছেড়ে যায় অকিঞ্চনের অন্ধকারে
কিংবা যেমন ভাইফোঁটা দেয় পরিত্যক্তা

পেঁপেপাতার জ্যামিতি

এমন দিন আসে
হাসাহাসির ভিতর দিয়ে রাস্তা হেঁটে যাবার সময় তাকে
পিটিয়ে শেষে হাসপাতালে পেঁাছে দিয়ে তার বাকি পোশাকে
মলোটভ ককটেল দিয়ে আগুন রেখে খলখলিয়ে নারকী উল্লাসে
শুভার্থীরা হাসে।

এমনও দিন আসে
তার স্মিত মুখ ঠিকরে পড়ে পেঁপেপাতার জ্যামিতিবিন্যাসে!

নিষ্ঠুর গরজী

তুমি বুঝি সব শ্মশানে রাখবে শিশির ?
চন্দনধূপে ধূ-ধূ নিরপেক্ষতা
মুছে দেবে ? কাপালিকদের হাত থেকে
বাঁচাবে যেখানে যতো উপাসনারতা ?
কেড়ে নেবে কাজ সমস্ত সন্ন্যাসির ?

এখানে এখন দুপুর উঠেছে জ্ব'লে
স্বনিয়মে। দ্যাখো ঘরণী পিছনে রেখে
সবচেয়ে গৃহী-প্রেমিকও গিয়েছে চ'লে ;
কী-এক মাধ্যাকর্ষণে প্রত্যেকে
মেতে আছে ! তুমি মমতা নিয়ে অযথা

কেন পাতালের পারিজাত যাও দ'লে ?

শরৎশীত : ট্যুবিঙ্গেনে

ভাট আর চারণেরা
আকাশে কাশফুল রেখে ঘুমোতে গিয়েছে

এতদিন স্তবস্তুতি হয়েছে অনেক,
প্রার্থনার মধ্যে ছিল পুঞ্জ অবসন্নতা, এখন
ঈশ্বর তোমার মুখে চেয়ে
স্তাবকাবনম্রতার প্রহর ফুরিয়ে গেছে, কোনো কাশফুল
চামর হবে না আর।
এবার তোমাকে প্রধানত
ভালোবাসবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে নরনারী

তুমি নিজে অন্তত নেবার জন্য তৈরি আছো তো?

প্রজন্ম জুড়াক

আপাদমস্তক কুয়াশাআবৃত ভিডিওযুগের এই তরুণেরা চলে যায় অনবরত সাইকেল বাজিয়ে শুধু ঐ যানযন্ত্র নয় যেন ওদের সবটাই লোহার আমি তবু আমার প্রৌঢ়তা থেকে বাক্‌প্রৌঢ়ি ঝরিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই ওরা তবু কেন কিছুতেই কথা বলতে দেয় না আমাকে

একদিন তবুও হবে চিন্তনের আদানপ্রদান জানি ওরা লৌহমানব নয় তাই প্রতিবিনিময় ঠিক ঘটে যাবে ঊষাগোধূলির দেহলিউন্মুখ অন্ধকারে আমার মৃত্যুর আগে অথবা পুরনো কোনো সতীর্থের শেষ জন্মদিনে

অবরোহী

এই শৈলাবাসে
আপাতত পালা শেষ। জনপদে ফিরবার আগে
দুটো কাজ বাকি : এক, অর্জিত রক্তের
ঝুরো কুঙ্কুমের রঙে গুহাচিত্র এঁকে যাওয়া, আর
তারপর নীরক্ত হয়ে নেমে যেতে হবেই আমাকে ;

নিচে আছে রক্তাল্পতার শান্তি, পর্বতবিজয়ী অন্ধকার ॥

প্রৌঢ়

১

সন্ন্যাসীর মৃত্যু হলে কাকে যাবো সান্ত্বনা জানাতে ?
বসেছে গাঁয়ের হাট, এইখানে শিশুদের নিয়ে
আসর জমত তাঁর, আমি কি তাদের ডেকে তবে
বলব তাঁর মৃত্যু হয়েছে ? ঐ গাছের ছায়ায়
মেয়েরা শুনত তাঁর কথকতা, ওরা আপাতত
নতুন কথক নিয়ে মজে আছে, তাদের বলব কি
এককণা অশ্রু ধার দিতে ? তাঁর জায়গায় আজ
উঠে এল যে-সন্ন্যাসী তাকে আমি সান্ত্বনা জানালে
সে আমায় ক্ষমা করবে ? স্তব্ধ আমি প্রান্তিক ক্যান্টিনে
দ্রুত যোগ দিতে যাই, যেরকম আনন্দের দিনে।

২

ক্রমশ দরগার মতো উঁচু হয় তোমার বিছানা :
ঠিকানার খাতা-বই-কলেজের পুরনো পত্রিকা
পুঞ্জীকৃত হতে থাকে সুজনির তলায় প্রতিদিন ;
তুমি যেন নিজ হাতে তোমার নিজস্ব জন্মকুণ্ডলী লেখার
দায়িত্ব নিতে চলেছ, জন্ম আর মৃত্যুর ভিতরে
বারসুই দিয়ে এক গ্রন্থনা খুঁজছো, ক্রমশই
উঁচু হয়ে উঠে যাচ্ছে তোমার নিজস্ব শয্যাধার,
এক্ষুনি খড়ম যেন পাশে রেখে ঘুমের ভিতরে
বাঁক নিতে যাবে তুমি—এমন সময়, ভেবে দ্যাখো,
বাঁকুড়া কলেজ থেকে যদি এক প্রেমিকযুগল
তাদের সংস্কারমুক্ত ছেলেমানুষির অধিকারে
তোমার সাক্ষাৎকার নিতে আসে, তাহলে কেমন
দুর্গতি তোমার হয়, তুমি কি তক্ষুণি ছুটে গিয়ে
তাদের করতে যাবে অভ্যর্থনা, আর আচম্বিতে
যদি পড়ে যাও তবে বলবে কি দুজন—যেরকম
বাংলাভাষায় আজ গুরু ও চণ্ডাল মিশে আছে—
'তাহলে মেসোমশায়, আপনারও পদস্খলন হলো ?'

স্পর্শাতীত

কুসুমং ফুল্লিতং এত পগ্গহেত্বান অঞ্জলিং
বুদ্ধসেট্ঠং সরিত্বান আকাসেমপি পূজয়ে।

—ধর্মপাল ভিক্ষু

সবশেষের বিকেলবেলায় মল্লিকাভ্রভাগে
যে-গাছ থেকে দিয়েছিলাম মল্লিকা তোমাকে
আজকে যখন সেইদিকে হঠাৎ
চোখ পড়েছে স্তব্ধ আমার হাত :
আরো অনেক ফুল ধরেছে গাছের অধঃশাখে।

আজকে আবার বিকেল হবে, তখন আমি যাঁকে
কুসুম দেবো, তিনি আরেকজন,
সেজন আমার তুমি-র তুমি, সবাই বলে তিনি নিরঞ্জন ;
গাছ থেকে ফুল না তুলে তাঁর মল্লিকাতীত হাতে
দেবো আমার প্রৌঢ় বয়স, বলবো 'সুপ্রভাত'॥